বাংলাদেশের রাজনীতিতে

শাহবাগ বনাম শাপলা

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব
শাইখুল হাদিস মাওলানা মামুনুল হক দা.বা.-এর

অভিমত

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সংকটাপন্ন মাদরাসা শিক্ষাকে পুনর্গঠনের অগ্রসেনানী, প্রখ্যাত আলেমে দীন, বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী রহ. আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বি ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন একনিষ্ঠ দাঈ এবং বিবেকবান মানুষ। যখনই কোনো অন্যায় অনাচার ঘটতে দেখেছেন—হোক দেশে অথবা বিদেশে, তার কলম এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বক্ষ্যমাণ পুস্তকটি তার ২০১৩ সালের শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ ও শাপলা চত্বরের মহাজাগরণ-সংশ্লিষ্ট দ্বান্দ্বিক ঘটনাপঞ্জির আলোকে রচিত কতিপয় প্রবন্ধের সংকলন। এতে তিনি নির্দ্বিধায় তার বিবেকনিঃসৃত কথামালা সাজিয়েছেন যুক্তি ও ইতিহাসের নিরিখে। এ ধরনের লেখা কেবল বিবেকবান দুঃসাহসিক লেখকের পক্ষেই লেখা সম্ভব।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তিনি নির্দ্বিধায় তথাকথিত প্রগতিশীলদের যেমন ধোলাই করেছেন, তেমনই অকপটে সরকারের নানা অনাচার-অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। পাঠক বইটির পরতে পরতে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। বইটি ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। অল্প সময়ের ব্যবধানে দু-দুটি সংস্করণ বের হবার পর সরকারি হস্তক্ষেপে প্রকাশককে সেলফ সেন্সরশিপের অংশ হিসেবে মার্কেট থেকে উঠিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়।

আকাশের মেঘ এখন কেটে গেছে, তাই বইটি বর্তমানে আবার ইত্তিহাদ পাবলিকেশনের মাধ্যমে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে—জানতে পেরে খুব ভালো লাগছে। মুক্ত স্বাধীন দেশে পাঠকবৃন্দ মাওলানা জালালাবাদী রহ. লিখিত বইটির সুচিন্তিত ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধসমূহের সাথে আবার নতুন করে পরিচিত

হতে পারবেন জেনে পুলক অনুভব করছি। এ বইটি পূর্বের ন্যায় পাঠকমহলে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

হজরত জালালাবাদী রহ. আমাদের নিকটবর্তী আকাবিরদের একজন। তার বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারা আমার জন্য গৌরবের। আল্লাহ মরহুম জালালাবাদী রহ.-এর এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।

গবেষক ও দার্শনিক
মুসা আল হাফিজ দা.বা.-এর

অভিমত

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীকে আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি? পেরেছি বলার সুযোগ নেই। তিনি নিজেই ছিলেন এক লাইব্রেরি—এটা কবুল করবেন অনেকেই। ছিলেন ইতিহাসের চলমানতায় যুক্ত—এটাও স্বীকার করা হবে। ছিলেন মনীষা ও পাণ্ডিত্যে জাতীয় ব্যক্তিত্ব—এটাও গ্রহণীয়। কিন্তু যে কথাটা কম উচ্চারিত বা প্রায় অনুচ্চারিত, তা হলো আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের কারিগর। একজন নিমগ্ন ও সচল লেখক ছিলেন তিনি। বহুমুখী বিচরণে প্রাজ্ঞ ও প্রভাবক মানুষ ছিলেন তিনি। বহুদর্শিতা তার ব্যক্তিত্বের ভান্ডারকে করেছিল বিপুলায়তন। জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাচক্রে পরিবর্তনের নির্ণায়ক জায়গাগুলোতে ছিল তার উপস্থিতি। বহির্বিশ্বের খ্যাতিমানদের জীবনে মিশেছিল তার জীবন।

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাচক্রে তার গভীর লিপ্ততা, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দেশ গঠনে তার প্রভাবক অবস্থান ও অবদান আমাদের ঋণী করেছে তার কাছে, কিন্তু ব্যাপারটা কেবল এতটুকুই নয়; বরং একজন লেখক ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার কণ্ঠস্বর বৃহত্তর জীবনের মূলধারায় যে বরেণ্যতাকে আমন্ত্রণ করেছিল, তা বলতে গেলে বিরল। একজন আলেম, গবেষক, সম্পাদক, অনুবাদক, খতিব, রম্য রচয়িতা ও বিদগ্ধ বিশ্লেষক মাওলানা জালালাবাদী—তাই কোনো বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করলে কান পেতে শুনতে হয়।

শাপলা ও শাহবাগ বাংলাদেশের ইতিহাসের জ্বলন্ত আলোচ্য বিষয়। ইতিহাসের নিবিড় পর্যটক হিসেবে জালালাবাদী এই বিষয়ে আপন অন্তর্দৃষ্টি বিস্তার করেছেন নানা প্রবন্ধে, নিবন্ধে। এসব রচনা ঘটনার ঠিক চলতি বাস্তবতায় রচিত ও পঠিত হয়। সেখানে শাপলার গণজাগরণকে তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন ও বিশ্লেষণ করেছেন, তা কেবল অতীতের বিষয় নয়, আজকের প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি যে প্রভাব ও গাম্ভীর্য নিয়ে স্মৃতিকথনের আদলে গোটা এক পটভূমিকে ব্যাখ্যা করেন, এই ভঙ্গিটাও প্রাজ্ঞ লেখকের বর্ণিলতায় সমৃদ্ধ। আবার শাপলা-সংশ্লিষ্ট নানা আপত্তি ও প্রোপাগান্ডার মোকাবেলায় তিনি যে ভাষা ও যুক্তি বিস্তার করেছেন, তার গুরুত্ব এখনো কমেনি; বরং বেড়েছে।

শাপলা-শাহবাগ প্রশ্নে জালালাবাদীর বিশ্লেষণকে নতুন মলাটে হাজির করছে ইত্তিহাদ। পাঠকের জন্য এটি শুভ বার্তা। আশা করি, ইত্তিহাদ সংস্করণ আদরণীয় হবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১
লংমার্চ ও মহাসমাবেশ ১৩
অরাজনৈতিক মহাসমাবেশ ১৫
বাংলাদেশের রাজনীতিতে শাহবাগ বনাম শাপলা ২১
কী চমৎকার অসাম্প্রদায়িক চেতনা! ৩২
এ রক্তক্ষরণ কী বার্তা দিয়ে গেল ৪০
হেফাজতে ইসলাম ও ওহাবি-সুন্নি হযবরল ৪৬
ভারতবর্ষে ওহাবি-সুন্নি দ্বন্দ্বের সূচনা ৫১
তেঁতুলতত্ত্ব কঠোর সত্য নিন্দুক জ্ঞানপাপী ৫৪
তেঁতুলতত্ত্বের সত্যতার সর্বশেষ সংযোজন ৬০
তেঁতুলতত্ত্বের বাবাতত্ত্ব ৬১

লংমার্চ ও মহাসমাবেশকথিত অকথিত কিছু কথা

আমার একাত্তর বছরের জীবনে দেখা লাখ লাখ লোকের তিনটি মহাসমাবেশ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সংঘটিত হলেও তিনটিই অবিস্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর প্রথমটি ১৯৭১ এর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশ।

এটি ছিল একটি রাজনৈতিক মহাসমাবেশ। এর পরেরটি ১৯৮১ সালের জুন মাসের ৩রা বা ৪ঠা তারিখে অনুষ্ঠিত শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জানাজা উপলক্ষে শেরেবাংলা নগরে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশ। তা ছিল নেহাতই তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মুষড়ে পড়া দেশবাসীর তার প্রতি সমবেদনা ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। তিনটির পেছনে যে তিন ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ কার্যকরী ছিল, তারা যে গণমানুষের মনে জাদুকরী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তৃতীয় মহাসমাবেশটি অনুষ্ঠিত হলো ৬ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখে।

বঙ্গবন্ধু যখন ভাষণ দিয়েছিলেন, তখন তিনি ন্যায্যত গোটা পাকিস্তানের নির্বাচিত জাতীয় নেতা। তাই কেবল পূর্ব-পাকিস্তানেরই নন, তখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক জাঁদরেল নেতা—মুফতি মাহমুদ, ওয়ালি খান, মাওলানা আহমদ নুরানি এমনকি মাওলানা মওদুদির মতো বিরোধী নেতা দ্বারাও সমর্থিত। এদের প্রত্যেকেই নির্বাচিত জাতীয় নেতা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন। অনেকেই জুলফিকার আলী ভুট্টোর হুমকিকে উপেক্ষা করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকাও এসেছিলেন। সুতরাং তার বক্তব্য শোনার আগ্রহে পতঙ্গের মতো লাখ লাখ লোক ছুটে আসবে—এটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বহির্বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলোও এ ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহলী ছিল। কেননা, এ সময় যে একটা নতুন জাতির অভ্যুদয় হতে যাচ্ছে তা তারা বেশ আঁচ করতে পারছিল।

তাই প্রচুরসংখ্যক বিদেশি সাংবাদিকও সে মহাসমাবেশ প্রত্যক্ষ করতে ছুটে এসেছিলেন।

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেই একাত্তর সালেই যখন আমাদের প্রায় জাতীয় নেতাদের অনুপস্থিতকালে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ারূপে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গোটা জাতির মধ্যে আশার আলো ও প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, তখনই গোটা জাতিরই কেবল নয়, গোটাবিশ্বেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনিই সর্বপ্রথম বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা করে বাংলাদেশকে একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও একটি মুসলিম রাষ্ট্ররূপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তার শাহাদাতের অব্যবহিত পরে রাষ্ট্রীয় উচ্চপর্যায়ের হজ প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে জেদ্দার রাজপ্রাসাদে আমরা যখন তৎকালীন সৌদি বাদশাহ খালিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হই, তখন তিনি আমারই হাতে হাতধরা অবস্থায় অত্যন্ত আবেগঘন ও বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘আপনারা কী করে জিয়াউর রহমানের মতো মুসলিম বিশ্বের এক সম্ভাবনাময় নেতাকে এভাবে হত্যা করতে পারলেন?’

তিনি আরও বলেছিলেন, ‘এই মাত্র কিছুদিন আগে এই জেদ্দায়ই অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ-সম্মেলনে তিনি যখন তিন ঘণ্টাব্যাপী অনবদ্য ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন আমরা মুসলিম বিশ্বের অন্য অন্য রাষ্ট্রপতিরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলাম আর পরস্পরে বলাবলি করছিলাম, আল্লাহ মুসলিম বিশ্বকে একজন নতুন যোগ্য নেতাই দান করেছেন। তার আয়ু যে এত অল্প হবে, তা তো আমরা কল্পানাই করতে পারিনি।’ আমাদেরই একজন রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে স্বয়ং সৌদি বাদশাহর এরূপ উচ্ছ্বসিত মন্তব্য শুনে আমরা যুগপৎভাবে বিস্মিত ও গর্বিত হয়েছিলাম। আমাদের মুখে কোনো জবাবই সরছিল না। রাজদরবার থেকে ফিরে এসে যখন আমাদের সৌদিপ্রবাসী অন্যান্য বাঙালি ভাইদের বললাম, তখন তারা জানালেন বাদশাহর মুখে আপনারা যা শুনে এসেছেন, তা আসলে এখানের সকলেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি। জিয়া হত্যার পর তিন দিন পর্যন্ত আমরা ঘর থেকে বেরোতে পারিনি। আমাদের দেখলেই সৌদিরা বলত—‘বাঙালি হারামি’ (উল্লেখ্য, সৌদিরা হারামি বলতে ডাকাতকে বুঝায়।)

সর্বশেষের এই মহাসমাবেশ ও লংমার্চেও যিনি মহানায়ক, তার সঙ্গে আমার পরিচয় বঙ্গবন্ধু ও শহিদ জিয়ার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অনেক আগে ১৯৬৬ সালে,

যখন তিনি যুবক আর আমি কিশোর। তারই সহপাঠী, পীরভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু সিলেটের মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া মরহুমের সফরসঙ্গীরূপে ওই সময় হাটহাজারী সফরে গেলে, তৎকালীন হাটহাজারী দারুল উলুমের মুহতামিম হজরত মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর আদেশে আমাকে সেদিন ওই সু-প্রাচীন মাদরাসাটির কয়েক হাজার ছাত্র-শিক্ষকের সম্মুখে বক্তৃতাও করতে হয়েছিল। *দৈনিক আজাদে* আমার সে বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিতও হয়েছিল। তাই হজরত মাওলানা আহমদ শফী (রহ.)-এর সঙ্গে পরিচয় ও হৃদ্যতার সম্পর্ক বহু পুরোনো। প্রথমোক্ত দুজন রাষ্ট্রপতি হলেও আমার প্রতি তাদেরও যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিল—যা আমার বিভিন্ন প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই এসেছে। তারা দুজনই ঘাতকের নির্দয় বুলেটের শিকার হয়েছেন। দোয়া করি, হজরত মাওলানাকে আল্লাহ অন্তত আদর্শগতভাবে বিপর্যস্ত বাঙালি মুসলমানদের তরীকে কূলে না ভিড়ানো পর্যন্ত দীর্ঘায়ু দান করুন। আমিন।[২]

অরাজনৈতিক মহাসমাবেশ

অরাজনৈতিক মহাসমাবেশ হিসেবেই কেবল নয়, এই শেষোক্ত মহাসমাবেশটিই যেন সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। কেননা, এর পেছনে কোনো পার্থিব-প্রাপ্তির সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, এর পেছনে যেভাবে আন্তর্জাতিক ইসলামবিরোধী চক্রের বলিষ্ঠ অপপ্রচার দেখা গেছে এবং সরকারি মহলের নানারূপ হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে, বিশেষত বিগত অল্প কিছুদিনের মধ্যে যেভাবে নির্বিচারে ১৭০ জন দাড়ি-টুপিপন্থিকে হত্যা করা হয়েছে, এমন সময় এরূপ একটি লংমার্চ ও মহাসমাবেশে অংশগ্রহণ ছিল চরম ঝুঁকিপূর্ণ। সরকারের অনুগ্রহধন্য ও সমর্থনপুষ্ট রাম-বাম-নাস্তিকরা যখন নজিরবিহীনভাবে বন্ধের দিন আবার রাতের বেলা হরতাল আহ্বান করে বসল, সরকারদলীয় বাস মালিক সমিতিই শুধু নয়, খাস সরকারি পরিবহন রেলগাড়ির সমস্ত যাত্রা যখন বাতিল করে দিয়ে এবং দক্ষিণ বাংলার প্রধান পরিবহন মাধ্যম লঞ্চ-স্টিমার পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে গোটা বাংলাদেশকে রাজধানী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো, তখন একেবারে জীবন বাজি রাখা ছাড়া, দেড় হাজার বছর পূর্বেকার সেই সাহাবায়ে কেরামের ঈমানি শক্তি ছাড়া, এতে অংশগ্রহণ ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। ঈমানের এরূপ মহা-পরীক্ষা এ জাতির জীবনে আর কোনোদিনই আসেনি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লামা আহমদ

২. ২০২০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ. ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। -নিরীক্ষক

শফীর সময়োপযোগী ডাকে সাড়া দিয়ে তার সুযোগ্য নেতৃত্বে এদেশের ঈমানদার জনগোষ্ঠী সে মহা-পরীক্ষায় নির্দ্বিধায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জাতি ঈমানের এ মহাপরীক্ষা দিতে ময়দানে নামতে সাহস সঞ্চার করতে পেরেছে, তাদেরকে আর পৃথিবীর কোনো শক্তিই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এটি আমাদের সরকার প্রশাসন এবং তাদের যারা পরিচালনা করছে, তাদেরও অনুধাবন করা উচিত বলে মনে করি।

এ প্রসঙ্গে 'নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক' ধর্মীয় নেতৃত্বের খেদমতে আমার একটি বিনীত আরজও আছে। নিরুপদ্রব থাকার উদ্দেশ্যে এই যে আপনারা বারবার বলছেন, আপনাদের তৎপরতা একান্তই 'নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক ধর্মীয়' খেদমত, তাতে কি অসৎ ও বেঈমান প্রতিপক্ষ আপনাদের বিন্দুমাত্র রেয়াত দিয়েছে? স্মর্তব্য,

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً

'ওরা কোনো ঈমানদারের ব্যাপারে আত্মীয়তার বা অঙ্গীকারের মর্যাদার ধার ধারে না।'[৩]

তারা কি মাসাধিক কাল ধরে যেভাবে দু-দুটি জাতীয় হাসপাতালের ছয় হাজার জীবনসংকটগ্রস্ত রোগীর ও দুটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও চার-চারটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মধ্যখানে উচ্চ ধ্বনিসম্পন্ন মাইকে অহরহ গর্জনরত কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীকে আহার্য ও পানীয় এবং ভ্রাম্যমাণ টয়লেট সুবিধা জুগিয়ে গেছে, এ লাখ লাখ নিঃস্বার্থ দূর-দূরান্ত থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মুমিনদের কি তারা একবেলাও সেসব সুবিধা সরবরাহ করেছে? তাহলে আপনারা কেন এরূপ কৈফিয়ত দিয়ে নিজেদের অযথাই ছোট করছেন? লক্ষণীয়, রাজনৈতিক গরজে অন্ধ-সরকার দলীয় নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত পরিবেশবাদী ও সুশীলসমাজও একেবারে চোখ বুজে রইলেন! কেউ একটিবারের জন্যেও ভাববার ফুরসত পেলেন না যে, জীবনসংকটগ্রস্ত যে হাজার হাজার রোগী একান্তই প্রাণরক্ষার আশায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে দেশের সেরা দুটি হাসপাতালে ছুটে এসেছেন, এতগুলো যুবক-যুবতীর জিঘাংসামূলক 'ফাঁসি ফাঁসি' কর্কশ স্লোগান আর উন্মত্ত কোরাসগান তাদের কাছে কী প্রাণান্তকর ঠেকেছিল!

---

৩. সুরা তাওবা : ১০

আমাদের মন্ত্রীদের অনেকেই মাশাআল্লাহ ডাক্তার-উকিল-ব্যারিস্টার! হাইকোর্টও খুবই নিকটে—যেখান থেকে অনেক ব্যাপারেই সুয়োমুটো বা বিনা মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত আদেশ জারি হয়ে থাকে।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আল্লাহর রহমত বলে অভিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ 'হারাম ঘোষণা' করেছিল। অনুরূপ বিদআতি মৌলবী আহমদ রেযা খাঁ বেরেলবি এবং তার সমচিন্তার তাবেদারি-প্রিয়রা 'ব্রিটিশভারত আল্লাহর ফযলে দারুল ইসলাম' বলে তারই প্রতিধ্বনি করেছিল। আল্লামা ইকবাল তখন পরম আক্ষেপ ও ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন,

মোল্লা কো জব মিল গায়ি সাজদে কী ইজাযত
নাদান নে সমঝ লিয়া কে হিন্দ মেঁ ইসলাম হ্যায় আযাদ
'মোল্লা যখন পেয়ে গেল সেজদা দেওয়ার অনুমতি
হিন্দুস্তানে ইসলাম আজাদ ভাবল নাদান সরলমতি।'

হজরত মাওলানা আহমদ শফী সাহেব! আপনি বা আপনার উস্তাদ ও পীর-মাশায়েখগণ তো সেই দলের লোক নন! আপনারই উস্তাদ ও পীর শাইখুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানির কথা আমার চাইতে আপনি ভালো করেই জানেন যে, তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, আধ্যাত্মিক জগতের গুরু ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসেনা বীর মুজাহিদ। ব্রিটিশ শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ই যখন বলা হতো 'ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না'—তিনি প্রকাশ্য রাজনৈতিক সমাবেশে ফতোয়া দিয়েছিলেন, কোনো মুসলিম-সন্তানের জন্য এটা কোনোক্রমেই বৈধ নয় যে, সে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে বলকানে গিয়ে মুসলিম ভাইদের বুকে গুলি চালাবে। এজন্য বিখ্যাত করাচি মামলায় তিনি ছিলেন এক নম্বর আসামি। বিখ্যাত খেলাফত নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও অন্যান্য জাতীয় আরও কয়েকজন নেতার নাম ছিল তার পরে। ওই মামলায় আদালতের সম্মুখে তার ঈমানদীপ্ত জবাবি ভাষণ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী শ্রদ্ধাভরে প্রকাশ্য আদালতের কাঠগড়ায়ই তার পদচুম্বন করেছিলেন। আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে হজরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. জাতিকে যে ডাক দিয়েছিলেন, তখনও যদি এ জাতির বোধোদয় হতো, তবে আজ হয়তো আমাদের এ দুর্দিন দেখতে হতো না। সেদিন তার ডাকের মর্ম আমাদের আজকের দুর্যোগগ্রস্ত অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেননি; কিন্তু পদ্মা-মেঘনা-যমুনার এত পানি গড়িয়ে যাওয়ার পর আজ যখন পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, তখনও কি আপনারা কাফের-বেদীনের পুতুলদের কাছে সিজদার ইজাযত আর লংমার্চের-

সমাবেশের মৌখিক অনুমতি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন আর তাদের অনুমতি ছাড়া মিসওয়াকের সঙ্গে সুন্নতি লাঠিটা হাতে রাখতেও ভয় পাবেন? লংমার্চ ও মহাসমাবেশ-বিরোধী হরতাল আহ্বানকারী বাম-রাম নাস্তিকরা যখন আপনাদের লোকদের রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে বেদম প্রহার করছিল, অথবা হজরত শাহজালালের সিলেট অভিযানকালে গৌড় গোবিন্দের সমস্ত নৌকা বন্ধ করে দেওয়ার মতো বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে আগমনেচ্ছুদের পারাপার বন্ধ করে দিয়েছিল, বা সার্থক লংমার্চ ও মহাসমাবেশ সম্পন্ন করে তাদের ফেরার পথে যে 'অহিংস' হরতালিরা তাদের হামলা করে রক্তাক্ত করছিল, তখন ওদের হাত কি খালি ছিল? ওদের হাতে তখন শুধু লাঠি তো নয়, অন্য অনেক কিছুই ছিল! তাহলে আপনাদের অনুসারীদের সুন্নতি লাঠি থেকে নিরস্ত্র রেখে জালেমদের গজারি লাঠির মারের নিরুপায় শিকারে পরিণত করছেন কেন? ওরা যে আমাদের এ বিনয়কে দীনতা বিবেচনা করে আরও উদ্ধত, আরও মারমুখী হয়ে ওঠে, এটা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? আর এ আরবি প্রবচনটি তো খুবই মশহুর, 'তাকাব্বুর মাআ মুতাকাব্বিরিন ফি হুকমিল ইনকিসার'—অর্থাৎ অহংকারী বেয়াদবের সঙ্গে অহংকার ও আত্মমর্যাদা প্রদর্শনই বিনয়। সুতরাং আগামীতে এ কথাটি মনে রাখাটাই কর্মীদের জন্য নিরাপদ হবে। দেশের পুলিশ যখন কর্তাদের মনোরঞ্জনে ক্ষমতাসীনদের ভদ্র প্রতিপক্ষকে ঠেঙ্গানোকে পদোন্নতির মোক্ষম উপায় বলে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত ও মহাব্যস্ত, আর এ কারণে দুষ্কৃতিকারী ও সন্ত্রাসীদের হাতে সাধারণ মানুষ শয়নকক্ষ থেকে রাস্তা পর্যন্ত কোথাও নিরাপদ নয়, তখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতি লাঠিটা হাতে রাখতে আমরা কুণ্ঠিত থাকব কোন যুক্তিতে?

রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি অবশ্যই আলোচনার আওতায় থাকবে। নতুবা আমাদের ধর্মচর্চা জীবনবিচ্ছিন্ন নিছক এক জড়তায় পর্যবসিত হতে বাধ্য—যা ধারণ করে মানুষ চলতে পারে না, বেঁচে থাকতে পারে না, সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না।

একেবারে নিকট প্রতিবেশী মায়ানমারে যখন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নেতৃত্বে সে দেশের মুসলিম জাতিগোষ্ঠী নির্মূল ও বিতাড়নের মহোৎসব চলছে আর আমরা গুলিতাড়িত মানুষগুলোকে আমাদের দরাজ কথাগুলো যদি আমাদের ধর্মীয় নেতাদের মুখে উচ্চারিত না হয়, তাহলে আমরা বিশ্বের সম্মুখে কোন ইসলাম আর কোন মানবতাবোধের নিদর্শন উপস্থাপিত করছি?

আমাদের মাদরাসাগুলোতে তাফসির পড়াতে গিয়ে আমরা বলব,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ, 'আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানমতে শাসন পরিচালনা করো (হে রাসুল!) এবং তোমাদের কাছে যে সত্য বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, তা ফেলে রেখে মানুষের খেয়ালখুশি তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব বা তথাকথিত গণতন্ত্রের অনুসরণ কোরো না।'[৪]

আর কার্যক্ষেত্রে ময়দান শয়তানি তাগুতি শক্তির ক্রীড়নকদের হাতে ছেড়ে রেখে আমরা কেবল 'ধর্মকর্ম' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব, এটা কি আমাদের এই শতকরা ৮৫/৯০ জন মুসলমান অধিবাসী অধ্যুষিত রাষ্ট্রের ধর্মীয় নেতাদের জন্য ইসলাম আদৌ অনুমোদন করে? এদেশের ২% মানুষের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েও 'টু' শব্দটি উচ্চারণ করে 'বন্ধু রাষ্ট্রের' কর্ণধারদের বিব্রত বা অসন্তুষ্ট করবার সাহস করব না, এটা কি ইসলাম অনুমোদন করে? একচল্লিশ বছর পুরোনো যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে এক বিশেষ মুহূর্তে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে দেশ ও জাতিকে রীতিমতো গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেব, অথচ বছরের পর বছর ধরে কোর্ট-হাইকোর্ট ডিঙিয়ে ঠান্ডা মাথার খুনিরূপে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দাগি আসামিদের বিশেষ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমা করে দেবেন, এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলে আইন অবমাননা, আদালত অবমাননা হয়ে যাবে। এরূপ কুফরি ধ্যান-ধারণাকে চুপটি মেরে মেনে নেওয়া যায়? এগুলো বললে রাজনীতি হয়ে যাবে, তাই বর্জনীয়? তাহলে তো আমাদের হাদিস ও ফিকহ-গ্রন্থগুলো থেকে 'কিতাবুল আকজিয়া' বা বিচার অধ্যায় তুলে দিতে হয় বা এগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়। আমাদের লাখ লাখ সরলমনা লোককে প্রলোভন দেখিয়ে, প্ররোচণা দিয়ে শেয়ার মার্কেটে টেনে নামিয়ে ফতুর করে ছেড়ে দেওয়া হবে, রাষ্ট্র তদন্তের মাধ্যমে তা বের করে আনলেও তার কোনো প্রতিকার করতে এমনকি দোষীদের নামও প্রকাশ করতে পারবে না, এ-কথা আলোচনায় আনব না? তাহলে দেড় হাজার বছর ধরে আমরা যে আল-কুরআনের আয়াতের বরাতে জুমার খুতবায় প্রচার করে আসছি,

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

'আল্লাহ ইনসাফ ও ইহসানের আদেশ দেন।'[৫]

৪. সুরা মায়েদা : ৪৮

৫. সুরা নাহল : ৯০

তার বাস্তবায়নটা কার মাধ্যমে আর কীভাবে সম্ভব হবে?

মুসলিম জনগোষ্ঠী যদি তাদের বাস্তব জীবনে আমাদের কাছ থেকে সমস্যামুক্তির নির্দেশনা না পায়, তাহলে তো তারা ধর্মের কেবল আনুষ্ঠানিক দিকসমূহ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারেই তাগুতি শক্তির উপরই নির্ভর করবে! এটা কি বাঞ্ছনীয় হবে? তাই দীন-দুনিয়ার তাবৎ সমস্যার সমাধানই কুরআন-হাদিসের আলোকে আমাদের নায়েবে-নবীদেরকেই কি আজ নির্দ্বিধায় জনগণের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে না? কেবল নেতিবাচক আন্দোলন-সংগ্রাম করেই কি আমাদের পেশা ও আদর্শগত দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে?